দ্বিমাসিক
# মঙ্গলবার্তা
১১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জুলাই-আগষ্ট ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন গঠনের পত্রিকা

**প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ**
যোসেফ বিশ্বাস

**সহ-সম্পাদক ঃ**
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার
মিঃ সন্তোষ মণ্ডল

**সার্কুলেশন ঃ**
দাউদ মণ্ডল

**কম্পিউটার কম্পোজ ঃ**
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

*বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা*

## সম্পাদকীয়

খ্রীষ্টীয় বার্তার একটি অপরিহার্য দিক হল, খ্রীষ্টমণ্ডলীর মঙ্গলবাণী ঘোষণা প্রেরণদায়িত্বের অন্তর্গত তার 'সামাজিক শিক্ষা' শিক্ষাদান ও প্রচার করা, কেননা এই শিক্ষা খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহনের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে সেই বার্তার প্রত্যক্ষ ফলাফল নির্দেশ করে, প্রাত্যহিক কাজ নির্ধারণ করে দেয় এবং ন্যায্যতার জন্য সংগ্রাম করে।

খ্রীষ্টমণ্ডলীকে দলিত, উপজাতি, শোষিতদের সঙ্গে এক হতে হবে। তাকে হতে হবে, দরিদ্রদের জন্য ও দরিদ্রদের মণ্ডলী, যার অর্থ দরিদ্রদের প্রতিদিনকার দরিদ্রতা, অবিচার ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় সামিল হওয়া।

সংলাপকে এশীয় মণ্ডলীর জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে হবে। সংলাপ, অংশগ্রহণ এবং সহায়তাদান হবে মণ্ডলীর সকল স্তরের একটি বাস্তবতা। আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যের অবিচ্ছেদ্য একটি দিক। এটা শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য সহযোগিতামূলক কাজকে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের উচিত সব মানুষের মধ্যে সার্বজনীন ভালবাসার জন্য কাজ করা। ভালবাসাই একমাত্র শক্তি, যা আমাদের সংঘবদ্ধ রাখতে পারে এবং স্বার্থপরতায় গড়ে ওঠা সব প্রতিবন্ধকতা গুড়িয়ে দিতে পারে।

মণ্ডলী মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য সম্পাদন করতে পারবে না, যদি না সে প্রথমে সুসমাচারসম্মত জীবন যাপন করে। মণ্ডলীর আহ্বান হল, যীশুর শুভ বার্তার সহভাগিতা করা, যার সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হল, ব্যক্তিগত পবিত্রতার সাক্ষ্যদান এবং খাঁটি শিষ্যত্বের জীবন।

বর্তমানে আমাদের দরকার একটি নবধারার মণ্ডলী, যার পরিচয় হবে যীশুর শিষ্যগণের সমাজ, যারা প্রেরণকার্যের জন্য জগতে প্রেরিত হয়েছে। মণ্ডলীর লক্ষ্য হল, ঐশরাজ্য আর সে এই ঐশরাজ্যেরই বীজ, চিহ্ন ও উপায়স্বরূপ।

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

# ব্যক্তিগত অনুধ্যান ও দলীয় সহভাগিতার জন্য প্রশ্ন

### (ক) সাধারণ উপলব্ধি

১। আপনার তিন বা চারটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি বা উপলব্ধি লিখুন।

২। বিশপগণের ভাবনাগুলো কি সত্যি সত্যিই প্রাসঙ্গিক ? এগুলো কি আজকের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জের প্রতি সাড়া দেয় ? লোকদের জন্য এগুলো কি একটি শুভ বার্তা ?

৩। আপনি কিসের উপর জোর দিতে, কি যোগ বা পরিবর্তন করতে চান ? আপনার ব্যক্তিগত ভাবনাগুলো কি কি ?

৪। পাঠের মধ্যে দেওয়া বক্সগুলির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী ?

### (খ) সংলাপ ও সহযোগিতা

১। উপরোক্ত প্রশ্নগুলোকে ঘিরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পটভূমির, ধর্মের ও মতাদর্শের লোকদের ভাবনা বা অভিমতগুলো কি কি ? তাদের এ সকল ভাবনা বিশপগণের ভাবনার সঙ্গে কিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ?

২। বিভিন্ন পটভূমির, সংস্কৃতির বা ধর্মের লোকদের জন্য বিশপগণের নীতিমালা, মূল্যবোধসমূহ ও ধারণাগুলোকে কি আরও ভালভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ?

৩। আমার ধর্মশাস্ত্রের ও সাহিত্যের কোন কোন অনুচ্ছেদ বিশপগণের বিবৃতিগুলো সমর্থন বা অস্বীকার করে ?

৪। ঐশরাজ্য, নতুন সমাজ ইত্যাদি ধারণাগুলো কি একই রকম দর্শন ও আদর্শের কথা বলে ? যদি না, তাহলে এগুলো কোন কোন দিক থেকে ভিন্ন ?

### (গ) প্রাসঙ্গিক কাজের নির্দেশাবলী

১। অধ্যায়ের কার্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী ? এগুলোর কিভাবে পূরক, উৎকর্ষসাধন ও বাস্তবরূপ ঘটানো সম্ভব ?

২। অধ্যায়ের প্রস্তাবনাগুলোর আলোকে কি কি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমার গ্রহণ করা উচিত ?

৩। দশম অধ্যায়ের কোন কোন প্রস্তাবগুলোর বাস্তববায়ন ঘটানো সম্ভব আর উচিত ? কিভাবে ?

৪। আমার অঞ্চল/এলাকায় এবং আমার কর্মস্থলে পরিস্থিতির উন্নয়নে কী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ?

৫। মণ্ডলী ও সমাজে কি কি কাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন (অধ্যায় ১১) ?

৬। কি কি দল বা আন্দোলন, কার্যক্রম বা সংগ্রামের আমরা শরিক হতে কিংবা কি কি দল বা আন্দোলন, কার্যক্রম বা সংগ্রাম দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি ?

# অধ্যায় ১
# মণ্ডলীগুলোর জাতীয় পরিষদ

'প্রোটেস্টান্ট' মণ্ডলীগুলোর অধিক সংখ্যা ও বিভিন্নতার কারণে তাদের সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা একটি বিশাল কাজ। তথাপি ভারতীয় মণ্ডলীগুলোর জাতীয় পরিষদের (NCCI) সামাজিক ভাবনা, বোধ করি, অনেক আদর্শস্বরূপ। NCCI প্রকৃতপক্ষে প্রোটেস্টান্ট ও অর্থডক্স মণ্ডলীগুলোর একটি জোট। বিগত বছরগুলিতে এ জোটের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলেও, NCCI প্রধান প্রধান প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলো এবং এর দলিলগুলোকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

এই আলোচনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে NCCI-র সামাজিক শিক্ষা এবং এর দু'টি পূর্বতন পরিষদ, অর্থাৎ জাতীয় মিশনারী পরিষদ (NMC) এবং জাতীয় খ্রীষ্টীয় পরিষদ (NCC)। আর এ জন্য NCCI-র Quadrennial সম্মেলনসমূহের দলিলের এবং অন্যান্য কয়েকটি অফিসিয়াল ও সেমি-অফিসিয়াল দলিলের সহায়তা নেওয়া হবে।

### ১। জাতীয় মিশনারী পরিষদ (১৯১৪-১৯২২)

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা হয় NMC। প্রেক্ষাপট ছিল বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে ভারতীয় প্রোটেস্টান্ট ও এ্যাংলিকান মণ্ডলীগুলোর মঙ্গলসমাচার প্রচার কার্যক্রমের উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বারোপ। এই কালপর্বে জগতের মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যের জন্য এই ভাবনা অংশতঃ এ অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় যে, সময় পূর্ণ হয়েছে, আর এই সুযোগটি খুব শীঘ্রই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আর এটাও উপলব্ধি হয় যে, প্রটেস্টান্ট ধর্মসম্প্রদায় ও মিশনারী সংগঠনগুলোর মধ্যে বিভক্তি দেশের মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যকে কঠিন করে তুলছে। তাই, ঐক্যের প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করা হয়েছিল। মণ্ডলীকে ঐক্যবদ্ধকরণের যৌগিক ও দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্য নিয়েই প্রথমে গঠন করা হয় আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক পরিষদগুলো আর শেষে NMC।

### ২। জাতীয় খ্রীষ্টীয় পরিষদ (১৯২৩-১৯৭৯)

এ ধারণা খুব শীঘ্রই ব্যাপকতা লাভ করে যে, মিশনারী সংঘ-সম্প্রদায়গুলো নয় কিন্তু মণ্ডলীগুলোই নেতৃত্বে থাকবে। ১৯২৩ NMC-র সংবিধান পরিবর্তন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল যেন এটা এই বাস্তবতার উপর আলোকপাত করে, আরও পরে ভারত, বার্মা ও সিংহলকে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) নিয়ে NCC গঠিত হয়। তবে নেতৃত্ব তখনো পর্যন্ত ছিল বিদেশী মিশনারীদের হাতে, আর গুরুত্বদানের প্রধান বিষয় হিসেবে মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য রয়ে গিয়েছিল। তথাপি, ১৯২৬-১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্ষুদ্র সময় জুড়ে, অনেক 'গ্রামীণ শিক্ষা' ও 'পুনর্গঠন' আর এমনকি 'ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল মিশন' নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হলেও, আদতে খুব কমই বাস্তবতার মুখ দেখে। প্রথম ভারতীয় নির্বাহী সেক্রেটারি হিসেবে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ড: আর.বি মানিকামকে নিয়োগের মধ্য দিয়ে, স্থানীয় কর্মীদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর বেশ আন্তরিকতার সাথে শুরু হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, সমগ্র পরিষদ 'যুদ্ধ-পরবর্তী ভারতে মণ্ডলী ও রাষ্ট্র' বিষয়ক একটি বিবৃতি প্রদান করে। এ বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে, 'সাম্রাজ্যবাদ খ্রীষ্টীয় বিবেকের নিকট অভিযুক্ত' আর 'এখনই এর সমাপ্তি টানা উচিত'।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর, NCC নতুনরূপে আত্মপ্রকাশিত একটি জাতির মুখোমুখি হওয়া অনেক সমস্যার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। ড: ই.সি. ভাট্টি, ১৯৫০ এর দশকে সিনিয়র সেক্রেটারি পদে আসীন হয়ে দেশ বিভাজনের পর বড় ধরনের ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছিলেন। NCC এবং অন্যান্য দলগুলো তথ্যপূর্ণ সামাজিক চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সামাজিক

গবেষণাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। এরই ফলে ১৯৫১ খ্রী: সংঘের অধ্যয়নের জন্য খ্রীষ্টীয় ইনস্টিটিউটের গঠন শুরু হয়। দ্বিতীয় একটি উপকরণ, অর্থাৎ সামাজিক ভাবনার উপর ভিত্তি করে NCC কর্তৃক ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়। সমকালীন হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট পণ্ডিত ড: পি.ডি দেবানন্দের প্রস্তাবক্রমে, এ দু'টিকে একত্রিত ক'রে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গঠন করা হয় ধর্ম ও সমাজ নিয়ে গবেষণার জন্য খ্রীষ্টীয় ইনস্টিটিউট (CISRS), যার প্রধান দপ্তর হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পি.ডি দেবানন্দর আকস্মিক মৃত্যুর পর CISRS-কে পরিচালনা যোগান এম.এম. থমাস।

NCC এর সদস্য মণ্ডলীগুলো, ১৯৫০ এর দশক জুড়ে এবং ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে তাদের বিভিন্ন বিবৃতির মধ্য দিয়ে, প্রকাশ করে যে, দেশে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলোর প্রতি তাদের নজর রয়েছে। মণ্ডলীগুলো স্বীকার করে যে, মঙ্গলসমাচার জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্য খ্রীষ্টের পুনঃসৃজনশীল ক্ষমতার কথা প্রচার করে। এগুলো সর্বোপরি অনুভব করে যে, বয়স্ক-শিক্ষা, বিভিন্ন সমবায়, কৃষি উন্নয়ন, গ্রামীণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বা সুস্বাস্থ্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় বিভিন্ন কর্মোদ্যোগ গ্রহণের অগাধ সুযোগ রয়েছে। আর তাই এগুলো নিজেদেরকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সেবামূলক কাজ ও অর্থনৈতিক নানা উন্নয়ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত করে। এগুলো সর্বান্তকরণে রাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, এগুলো ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করে ঃ একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পরিকল্পনা প্রকৃত খ্রীষ্টীয় নাগরিকত্বের অন্তরায় নয়।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে NCC সম্মেলনের বাণীতে উল্লেখ করে বলা হয় যে, আমাদের দেশে মানুষের চাহিদার যে ব্যাপকতা তার উচিত... আমাদের আত্মতুষ্টিবোধকে নিবৃত্ত ক'রে, খ্রীষ্টের প্রেম ও দয়ার মাধ্যম হওয়ার লক্ষ্যে এক নতুন অঙ্গীকারের দিকে আমাদের চালিত করা। ১৯৬০ দশক পরবর্তী সময়ে, সামাজিক ন্যায্যতা, বিভিন্ন জনসংগঠন, মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ, নিপীড়িতদের পক্ষাবলম্বন, ইত্যাদি মূলভাবগুলো সামনের সারিতে চলে আসে। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে, সামাজিক কাজ বিষয়ক কমিশন রিপোর্টে বলা হয় : ভারতের অনেক জায়গায়, প্রাথমিক অবিচারটি হচ্ছে প্রকট ও ব্যাপকবিস্তৃত দরিদ্রতা... এই অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, জাতির জীবনের জন্য প্রথম অগ্রাধিকারের বিষয়। আর এ বিষয়টিকে ভারতীয় মণ্ডলীর সামাজিক ভাবনাসমূহের মাঝে প্রথম স্থান দখল করে নিতে হবে। কাজেই, মণ্ডলীগুলোর প্রয়োজন, শ্রেণী বা বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায্যতার জন্য তাদের সংগ্রামে, ভারতীয় দরিদ্র জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশে তাদের সকল লোকদের প্রস্তুত করার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করার।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, অষ্টাদশ সম্মেলনের বাণীতে গুরুত্বারোপ করা হয় মুক্তি ও অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর। স্বীকার করে বলা হয় যে, মণ্ডলী মুক্তির জন্য লোকদের সংগ্রামে সহযোগি হওয়ার জন্য মনোনীত, আহূত। এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করা হয় : অতীতে, বিভিন্ন মণ্ডলী ও খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নমুখী কার্যক্রমগুলো মূলত: এমন এক শ্রেণীর পক্ষে কাজ করেছে যারা ক্ষমতা ও প্রভাব এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণের উৎসগুলোর কাছাকাছি থাকার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল... আজকে মণ্ডলীর জন্য সময় এসেছে গ্রামীণ জনপদ, ভূমিহীন শ্রমিক, অশিক্ষিত, গ্রামের বেকার জনগণ, প্রান্তসীমার কৃষকগণ, বস্তিবাসী ইত্যাদির উপর এর মনোনিবেশ ঘটানোর। সম্মেলনে আরও ঘোষণা করা হয় প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে এর বিশ্বাসের কথা, যিনি আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন মুক্তির জন্য সংগ্রামে তাঁর সঙ্গে ও তাঁর লোকদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য, যেন সকলেই জীবন পেতে পারে, পরিপূর্ণভাবেই তা পেতে পারে।

## ৩। ভারতীয় মণ্ডলীগুলোর জাতীয় পরিষদ (১৯৮০-২০০৪)

### উন্নয়ন ও মুক্তি

১৯৮০ এর দশকে, NCCI উন্নয়ন ধারণা এবং উন্নয়নে মণ্ডলীর ভূমিকার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুনর্ভাবনা লক্ষ্য করে। উনিশতম সম্মেলনে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা হয় যে, NCCI জাতীয় ও আঞ্চলিক

বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায্যতার সমগ্র ধারণাকে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে। স্বচ্ছতা অর্জনে গঠন করা হয় একটি উন্নয়ন কার্যকরী দল। এর ১৯৮৩ খ্রী: প্রতিবেদনে পোপ ষষ্ঠ পলের 'মানব-উন্নয়ন' নামক সার্বজনীন পত্রের উল্লেখ ক'রে উন্নয়নের নানাবিধ চিত্র তুলে ধরা হয় : উন্নয়নের ধারাকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। এটা অবশ্যই হতে হবে প্রকৃত, এটা অবশ্যই হতে সার্বিক। আরেক কথায়, উন্নয়ন অবশ্যই হবে অখণ্ড, অর্থাৎ, একে অবশ্যই প্রতিটি ব্যক্তির মঙ্গল নিশ্চিত করতে হবে... উন্নয়ন বলতে আরও বুঝায় 'মুক্তি'। এ মুক্তির মধ্যে অন্তর্গত কম উন্নত মানব অবস্থা থেকে অনেক উন্নত মানব অবস্থায় উত্তরণ অর্থাৎ নিপীড়নধর্মী সামাজিক কাঠামোগুলোর রূপান্তরসাধন... উন্নয়নের সম্পর্ক হচ্ছে রুজি ও রোজগারের সঙ্গে, ধারণা ও স্বপ্নের সঙ্গে, পরিচয়, অহংকার ও ভালবাসার সঙ্গে।

### সার্বিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

*উন্নয়নকে ঘিরে বিতর্ক শুধুমাত্র দরিদ্রতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। উন্নয়ন, মুক্তি, সামাজিক ন্যায্যতা, মানবাধিকার – এগুলো সবই পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত। অন্য কথায়, উন্নয়ন অর্থ সে সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহ, যেগুলো যে যেমন অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে, সেগুলোর প্রভাব থেকে মুক্তি। উন্নয়নের কখনো কখনো অর্থ বিদ্রোহ। ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, জনগণ সে সকল অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যেগুলো মানুষ হিসেবে তাদের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে।*

প্রতিবেদনে ভারতীয় মণ্ডলীর বেশ সমালোচনা করা হয়, একে প্রধানত: 'প্রাতিষ্ঠানিক মিশনের' সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এখানে আরও বলা হয় যে, মণ্ডলী প্রশংসাতেই সন্তুষ্ট থাকে যা সে মূলত: তার চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দরুণ পেয়ে থাকে। তবে বাস্তবে, তৎকালীন খ্রীষ্টীয় প্রাতিষ্ঠানিক মিশনের বর্তমানে যা রয়ে গিয়েছে, তা হচ্ছে, একটি অভিজাত, উচ্চমাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিভূত কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ, যে কাঠামো সবদিক থেকে দরিদ্রদের এবং সার্বিক মানবতা অর্জনের দরিদ্রদের সংগ্রামকে দূরে সরিয়ে রাখে। সর্বোপরি, উন্নয়ন হচ্ছে একটি সার্বিক মানবতা অর্জনের লক্ষ্যে, যাদেরকে অমানুষে পরিণত করা হয়েছে, তাদের সংগ্রামকে উৎসাহদান।

এ সকল ভাবনা থেকে সম্ভবত অনুপ্রেরণা লাভ করে, ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশতম সম্মেলনে নিপীড়নধর্মী কাঠামোগুলোয়, বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদগুলোতে, আমূল পরিবর্তন আনয়নের আহ্বান জানানো হয়। এ সম্মেলনে মণ্ডলীগুলোকে এমন একটি পরিবার গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় যেখানে মানব ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সম্মেলন উদ্বিগ্নের সাথে পণপ্রথার কারণে নারীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা, বিবাহের সেকেলে নিয়মনীতি, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, ইত্যাদিও লক্ষ্য করে। কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা এখনো বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বিরাজ করছে।

## দরিদ্র ও নিপীড়িতদের পক্ষাবলম্বন

১৯৯০ এর দশকে, দলিত খ্রীষ্টানদের জন্য রিজার্ভেশনের মত বিষয়গুলো অনেক বেশী সামনে চলে আসে, বিশেষ করে ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে দলিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এই সুবিধাটি প্রদান করা হলে। মনে করা হয়েছিল, কেন্দ্রিয় সরকারের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা হলে দলিত খ্রীষ্টানরাও এই একই সুবিধা পাবে।

১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে NCCI নতুন দিল্লীতে মণ্ডলীসমূহের প্রধানদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে, যার মূলসুর ছিল 'খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের আগামী দিনের দিকে অগ্রসর'। সম্মেলনের বাণীতে গুরুত্বারোপ করে বলা হয় যে, এখানকার বাস্তবতা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বহুত্ববাদ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, এগুলো সবই আমাদের সমাজকে যেমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত করছে তেমনি উত্তেজনাও ছড়াচ্ছে। বর্ণবাদ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিহীনতা দলিতদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও অন্যায়ের দিকে চালিত করে... নারীরা শিকার হয় অমর্যাদার, লাঞ্ছনার,

শোষণের এবং বৈষম্যের যেগুলোর কারণ হচ্ছে যুগ যুগ ধরে চলে আসা পিতৃতান্ত্রিক নানা বদ্ধ ধারণা, মনোভাব ও কাঠামো, আর এগুলোকে অনেক সময় সমর্থন যোগায় ধর্ম ও সংস্কৃতি। এর প্রত্যুত্তরে, মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় : প্রেরণদায়িত্ব অর্থ দরিদ্র ও নিপীড়িতদের পক্ষাবলম্বন, তাদের চাহিদার সাড়াদান, এমনটি মনে করে যে, সকল সংস্কৃতিতে এবং অনান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যে ঈশ্বর বিরাজমান এবং উপস্থিতি, সংহতি ও বাণীর মাধ্যমে ঐশরাজ্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান করা।

খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজ নিজ প্রেরণদায়িত্ব মূল্যায়ন করে দেখার জন্য পুনরায় আহ্বান জানানো হয় : যখন সেবা ও পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে এগুলো (প্রতিষ্ঠানসমূহ) প্রয়োজন, তখন সময় উপস্থিত হয়েছে ঈশ্বরের লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য সমালোচনার দৃষ্টিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার। এগুলো কি উন্নয়ন ও মুক্তির লক্ষ্যে সমাজের দরিদ্র, অভাবী ও নিপীড়িত শ্রেণীর লোকদের সেবা দিয়ে আসছে ? এগুলো কি ঐশরাজ্যের মূল্যবোধগুলোর কথা প্রচার করছে ?

মণ্ডলীগুলোর উদ্দেশে প্রথম দু'টি পরামার্শ ছিল :

(১) এগুলো যেন জাতীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট ভাষায় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তুলে ধরে, যেমন দলিতদের মুক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি হুমকি, নারীর বিরুদ্ধে নৃশংসতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) এগুলো যেন কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়ার লক্ষ্যে লিঙ্গ নির্ধারণের মত প্রক্রিয়াগুলোর পৈশাচিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়।

অবাক হওয়ার মত বিষয় হল, দেশে বিরাজমান প্রকট অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং অয্যোধ্যায় বাবরি মজসিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সম্পর্কে সম্মেলনের বাণীতে কিছু বলা হয়নি।

### বিশ্বায়নের যুগ এবং সাম্প্রদায়িকতা

তবে সম্মেলনের বাণীতে অর্থনৈতিক সংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে : নতুন অর্থনৈতিক নীতি, যা এর মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে বয়ে এনেছে একটি বাজার-বান্ধব সমাজ, তা দরিদ্র ও প্রান্তসীমার লোকদের জন্য একটি বিপজ্জনক হুমকিতে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি আমাদের সমাজে একটি জীবন-পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। খ্রীষ্টানদের জন্য চাকুরি রিজার্ভেশন সংক্রান্ত বিষয়ে বাণীতে দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয় যে, লোকসভা দলিত খ্রীষ্টানদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে, মণ্ডলী সমতা, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায্যতা ও শান্তির ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের নিজেদের মৌলিক অধিকার ও মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য সকলের মধ্যে সতেচনতা গড়ে তোলাকে উৎসাহিত করার জন্য আহূত হয়েছে ।

এর বিভিন্ন সুপারিশের প্রতি আবেদন জানিয়ে সম্মেলনের বাণীতে বলা হয় :

(১) জরুরীভিত্তিতে দলিত খ্রীষ্টানদের দুঃখ-দুর্দশার লাঘব ঘটানোর জন্য,

(২) নারীর (আর সেই সাথে জন্মগ্রহণ না করা নারী শিশুর) বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহিংসতা অবসানের লক্ষ্যে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য, এবং

(৩) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং জাতীয় শান্তির প্রতি হুমকির কারণ হয় এরূপ কর্মকাণ্ডকে অনুৎসাহিত করার জন্য।

এ বাণীতে আও বলা হয় : আমরা সরকারের সঙ্গে আমাদের সংহতি প্রকাশ করছি, যে সরকার মানবাধিকারকে সম্মান করবে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও দেশের ঐক্য সমর্থন করবে।

১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট ও উড়িষ্যার ন্যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ ঘটনার পর NCCI-র ২৪ সম্মেলনের বাণীতে বলা হয় : আমাদের দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ দরিদ্র ও প্রান্তসীমার জনগণের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তুলেছে। এখন খ্রীষ্টানদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দলগুলোকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। মণ্ডলী আজকে মুখোমুখি চূড়ান্ত সময়ের (Kairos) – একটি সূক্ষ্ম কাল সকল প্রকার বিঘ্ন ও সীমাবদ্ধতাসত্ত্বেও আত্মনিয়োজন ও সেবার মনোভাব নিয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য।

এ বাণী সাহসের সাথে এগিয়ে চলে : হিন্দু মৌলবাদীরা আমাদের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ও প্ররোচনার

মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার কাজে নিয়োজিত বলে অভিযোগ আনছে। কিন্তু বিগত দু'টি বছরে, প্রোটেস্টান্ট, অর্থডক্স ও রোমান কাথলিক মণ্ডলীগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, এই অভিযোগটি... বানোয়াট, মিথ্যা প্রচারণা... উদ্দেশ্য হল দরিদ্রদের সেবা করা এবং তাদের মর্যাদা ও মানবাধিকারের তুলে ধরা থেকে মণ্ডলীকে প্রতিহত এবং আতঙ্কিত করা। এ মণ্ডলী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতে প্রান্তসীমার ও দরিদ্রদের উদ্দেশে তার সেবাকাজকে বেগবান করার জন্য, আর এইভাবে সকল জনগণ, দলিত, আদিবাসী, নারী, যুব, ছেলেমেয়ে এবং আরও অনেক শ্রেণীর মানুষের মর্যাদা ও জীবনের পূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য আহূত হয়েছে। এ বলে বাণীর সমাপনী টানা হয়েছে : আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতরা, যেন তারা তাদের মর্যাদা ও অধিকার দাবি করতে এবং তাদের নিজস্ব ইতিহাসের আওতাধীন হয়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের অনুসরণ করা।

NCCI-র ২৫ সম্মেলন এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হয় যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গন সংহিসতায় জর্জরিত, যেমন ২০০১ খ্রী: ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংস, এর পর আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধ, ২০০২ খ্রী: ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের গুজরাট হত্যাকাণ্ড। দলিত, আদিবাসী ও নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়টিও এ সম্মেলনে উঠে আসে। প্রথমবারের মত যারা এইচআইভি বা এইডসে আক্রান্তদের দুঃখকষ্ট এবং তাদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনের বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পায়। এ সকল চ্যালেঞ্জের মুখে, সম্মেলনের বাণী মণ্ডলীকে আহ্বান জানায় এর হারানো দর্শন পুনরুদ্ধার করার এবং সমাজে প্রাবক্তিক কণ্ঠ হওয়ার এর যে আহ্বান তা পূরণ করার জন্য।

প্রধান সমস্যা সাম্প্রদায়িকতার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে, এ বাণীতে রাষ্ট্রকে আহ্বান জানানো হয় দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো সমুন্নত রাখার এবং প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, পাশাপাশি, যে-কোন ধর্ম বা সংস্কৃতিতে ঘাপটি মেরে থাকা সকল সাম্প্রদায়িক বা ফ্যাসিবাদী শক্তির নিন্দা জানানো ও এগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামও করার জন্য। মণ্ডলী সর্বোপরি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে :

(১) ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে কন্যা শিশুর জীবন রক্ষায় সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করা;

(২) প্রান্তসীমার মধ্যে বসবাসকারীদের, বিশেষ করে

## ২০০৫ উত্তর ভারতীয় সিনড

*২০০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রায় ৩০০ সদদেস্যর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ভারতীয় মণ্ডলীর (CNI) সিনড। এ সিনডের মূলসুর ছিল 'একটি রূপান্তরিত ও রূপান্তরশীল সমাজের লক্ষ্যে'। সমাপনী বাণীতে সাধারণভাবে সকলকে আর বিশেষ করে মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাদের জীবনের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোর পরিবর্তনসাধনে কাজ করে যাওয়ার, সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার, এবং যারা দরিদ্রতা, অবিচার ও নিপীড়নের শিকার তাদের পাশে দাঁড়ানোর আর তাদের মানব মর্যাদা ও সমতার অধিকারগুলোর সমর্থন যোগানোর আহ্বান জানানো হয়। এ সিনডে আরও আহ্বান জানানো হয় যারা প্রবীণ, যারা শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং সমাজে যাদের অবস্থান নিম্নে তাদের মর্যাদা, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য।*

*এছাড়াও ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় জনগণের সিনড, যেখানে প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ ঘটেছিল। এ সিনড ছিল উত্তর ভারতীয় মণ্ডলীকে নবায়িত ও পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যে খ্রীষ্টভক্তগণের একটি স্বাধীন উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য হল, যাদের সেবা করার জন্য এ মণ্ডলী আহূত সেই দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য এ মণ্ডলীকে আরও বেশী সহমর্মী ও অঙ্গীকারবদ্ধ করে তোলা। অংশগ্রহণকারীগণ আশা করেন যে, এই পদক্ষেপটি উত্তর ভারতীয় মণ্ডলীকে একটি গণ-আন্দোলনমুখী মণ্ডলী হওয়ার লক্ষ্যে সমাজগুলিকে গঠনের দিকে চালিত করবে।*

দলিত, উপজাতি, আদিবাসী, দেশীয় জনগণ ও নারীর অধিকারকে সমর্থন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতার মোকাবেলা করা;

(৩) বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া, কেননা এটা মানুষ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার তাদের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত রাখে।

### উপসংহার

সুতরাং এ আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রোটেস্টান্ট ও অর্থডক্স মণ্ডলীগুলো এ দেশের সমাজব্যবস্থাকে ঘিরে তাদের উল্লেখযোগ্য চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। তবে এ ধরনের বিষয়গুলোর উপরও প্রতিনিয়ত আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন দরিদ্রদের দুরবস্থা, নিপীড়িতদের জন্য ন্যায়বিচার, নারীর সমান অধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের প্রয়োজনীয়তা। এ সকল বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিবার আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয় হয় যে, মণ্ডলী আহূত হয়েছে এর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মত কাজ করতে, যাদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ইত্যাদির কাঠামোর বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করার জন্য। এই উপায়ে প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলোর এবং NCCI-র সামাজিক শিক্ষা সদস্য মণ্ডলীগুলোকে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছে, যেখানে ন্যায্যতা, লিঙ্গ সমতা এবং আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি শাসন করবে ।

"খ্রীষ্টীয় পরিবার ধর্মবিশ্বাস হস্তান্তর করে
যখন পিতামাতা তাদের সন্তানদের প্রার্থনা করতে শিখান,
যখন তারা তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেন;
যখন তারা সংস্কারসমূহের দিকে তাদের সন্তানদের চালিত করেন,
যখন তারা মণ্ডলীর জীবনের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন;
যখন তারা সবাই মিলে একসাথে পবিত্র বাইবেল পাঠ করে,
তাদের পারিবারিক জীবনের উপর বিশ্বাসের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে দেয়
এবং আমাদের পিতা হিসেবে ঈশ্বরের প্রশংসাকীর্তন করে।" *(পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট)*

### অধ্যায় ২

# ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (CBCI)

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ভারতীয় মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা নিয়ে। ভারতীয় মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা পাঠকারী আমার কয়েকজন বন্ধু অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন এ ব্যাপারে একটা সুন্দর ভূমিকা উপস্থাপন করি, কেননা অধিকাংশ খ্রীষ্টভক্ত খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার (STC) সঙ্গে পরিচিত নয়। যখন অন্যেরা জোর দিয়েছিলেন আমি যেন এই বইটির (STC) উদ্দেশ্য ও শিক্ষাপদ্ধতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা যুগিয়ে একে পাঠক-বান্ধব করে তুলি। তারা বলেছিলেন, 'যাদের জন্য STC তাদের নিকট পৌঁছানোর পথ খুঁজে পাওয়া এখনো একটি সুসংরক্ষিত গোপন বিষয়। এই বইটির প্রভাবকে সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়িয়ে তুলুন। একে এমন একটি সহায়ক উপকরণ করে তুলুন যা সামাজিক পরিচালকদের এবং যাদের বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ নেই, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের, তাদের জন্য এটা ক্ষমতা যোগাবে। ঠিক মত বুঝা হলে, সব মানুষের জন্য এটা অনেক অর্থবহ হবে !'

আর ঠিক এ কাজটিই আমি এখানে করার চেষ্টা করব আর তা করব ছয়টি শিরোনামে :

(১) বাস্তবায়ন : বিষয়বস্তুর কেন্দ্রমূল,
(২) খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা,
(৩) ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ,
(৪) ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর চূড়ান্ত বিবৃতি,
(৫) এ অধ্যয়নের প্রক্রিয়া, পরিধি ও রূপরেখা, এবং
(৬) ফলপ্রসূ পাঠ ও প্রাসঙ্গিক কাজের নানা পরামর্শ।

## ১। বাস্তবায়ন : বিষয়বস্তুর কেন্দ্রমূল

আমার এক বন্ধু আমাকে দু'টি রচনাকর্ম দিয়েছিলেন যা STC এর সঙ্গে পরিচিত অধিকাংশ পাঠকের প্রতিক্রিয়া বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। এক পুরোহিত হিব্রু ধর্মশাস্ত্র থেকে নেওয়া একটি চমৎকার বাক্যের প্রতি শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন, যা হল দর্শন বিহীন একটি জাতির ক্ষয় অনিবার্য। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, খ্রীষ্টীয় দর্শনটি বাইবেলেই নিহিত আছে আর এটা খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষায় সুসমৃদ্ধ।

২০০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাবেক প্রধান Michel Camdessus চেক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট Vaclav Havel এর সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন, কেননা চেক প্রেসিডেন্ট দাবি জানিয়েছিলেন যে, বিশ্ব অর্থনীতির পুনর্গঠনের চেয়ে আমাদের সভ্যতার সমগ্র মূল্যবোধ ব্যবস্থার পুনর্গঠন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাবেক প্রধানের মতে, একটি অনেক বেশী ভ্রাতৃপ্রতীম বিশ্ব। বিশেষ করে, দারিদ্র্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও সংহতির বিশ্ববোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান নীতিমালা ও মূল্যবোধগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে, খ্রীষ্টমণ্ডলী বিশ্বায়নের ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আজকের জগতে প্রভূত অবদান রাখতে পারে। মণ্ডলী মানব আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিসাধনও সম্ভব করে তুলতে পারে, যা নতুন মূল্যবোধ ব্যবস্থার জন্য অত্যাবশ্যক।

আজকের জগতে একটি প্রাসঙ্গিক দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার এবং নতুন নতুন মূল্যবোধের ক্রমবিকাশ সন্দেহাতীতভাবে একটি গুরু দায়িত্ব। নিজেদেরকে যারা STC এর সঙ্গে পরিচিতি করে তুলেছেন, তারা এ ব্যাপারে প্রায়শ অনুপ্রাণিত বোধ করেন। জনগণকে অবশ্যই সমসাময়িক সমস্যাগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠতে এবং প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আমাদের সরলতা, আন্তরিকতার চিহ্ন আমদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজের কাঠামোগুলোয় আমাদের

মূল্যবোধসমূহের প্রতিফলনে নিহিত। অনেক, সম্ভবত সিংহভাগ মানুষ, চমৎকার চমৎকার মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত সুন্দর সুন্দর বিবৃতির মুখে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছে – তা বিবৃতিগুলো জাতিসংঘ, সরকার, সেমিনার, কর্মশালা বা মণ্ডলী যেখান থেকেই আসুক না কেন।

এমনকি পোপ ষষ্ঠ পল ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বলেছেন যে, নীতিমালা, লক্ষ্যসমূহ এবং 'প্রাবক্তিক যত ধিক্কার' যথেষ্ট নয়। তাই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন 'কার্যকর পদক্ষেপের' জন্য । তার নিজের তরফ থেকে, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাবেক প্রধান Michel Camdessus ব্যক্ত করেছিলেন, যে সকল অঙ্গীকার আমরা ইতোমধ্যে করেছি সেগুলো পূরণে জনমত সংগঠনে একটি বিশ্ব কার্যক্রমের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা। জগত ও এর বিভিন্ন সংগঠনগুলোর করণীয় হবে একবিংশ শতকের প্রথম দশক বিভিন্ন অঙ্গীকার পূরণে ব্যয় করা। নিজেদেরকে যারা STC এর সঙ্গে পরিচিতি করে তুলেছেন, তারা এর বাস্তবায়নে বিস্ময় প্রকাশ করেন। মণ্ডলী কি তার নিজ জীবন ও প্রতিষ্ঠানসমূহে তার সামাজিক শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছে ? পৃথিবীর বুকে STC এর অধিকতর প্রভাব কিভাবে নিশ্চিত করা যায় ?

## ২।খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা (STC)

STC এর জন্য স্বীকৃত পরিষদ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে Rerum Novarum এর ব্যাখ্যার কাজে হাত দিয়েছিল। 'প্রথম ৭০টি বছর কাথলিক সামাজিক ভাবনা, বলতে গেলে প্রায় পুরোপুরি, পাশ্চাত্য শিল্প সমাজের সামাজিক সমস্যাগুলোকে ঘিরে আবর্ত ছিল। শুধুমাত্র বিগত চল্লিশটি বছর, অর্থাৎ পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের Mater et Magistra এর সময়কাল থেকে, কাথলিক সামাজিক ভাবনা ক্রমবর্ধমানভাবে পৃথিবীব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে শুরু করেছে। বিশেষ ক'রে পরবর্তীতে, STC এর ব্যাপক প্রসার ঘটতে শুরু করে, তবে শুধুমাত্র এর মূলভাবনা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, এর কার্যক্রম, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষাপদ্ধতিরও দিক থেকে প্রসার ঘটে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান Gaudium et Spes (GS) জগতে তার উপস্থিতিকে ঘিরে খ্রীষ্টমণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বাস্তব সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

তাই, STC এর প্রকৃতি ও কার্যক্রম এখানে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ পল লিখেছেন, আজকের নতুন নতুন সমস্যা ও প্রশ্নের মুখে, খ্রীষ্টমণ্ডলী জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশার প্রতি সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর সকল গতিশীলতায়, STC মানুষের তাদের অন্বেষণে সঙ্গী হয়। যদি এটা একটি প্রদত্ত কাঠামোকে আইনত প্রামাণিক বলে প্রতিপন্ন করার জন্য অথবা পূর্বনির্ধারিত নমুনার প্রস্তাব করার জন্য হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে এটা এর ফলে নিজেকে সাধারণ নীতিমালার স্মরণে সীমাবদ্ধও করে না। এটা গড়ে ওঠে এই জগতের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপর, নবায়নের উৎসরূপ মঙ্গলসমাচারের চালিকা-শক্তির তত্ত্বাবধানে, আলোকপাতের মাধ্যমে। এটা আরও গড়ে ওঠে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবেনদশীলতায়, যা সেবা করার স্বার্থশূন্য ইচ্ছা দ্বারা এবং চরম দরিদ্রদের প্রতি মনোযোগ দান দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর সুশোভিত অভিজ্ঞতা থেকে, STC জগতের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রয়োজন অসমসাহসী ও সৃজনশীল নবীনতার প্রস্তাব করে।

STC এর ২০০৪ সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে : "মঙ্গলসমাচারের চিরন্তন আলোয় পরিচালিত এবং সমজের ক্রমবিকাশের প্রতি চির মনোযোগী" STC "নিরবচ্ছিন্নতা ও নবায়ন দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত"। এটা হচ্ছে এমন "একটি 'কর্মস্থল' যেখানে কাজ সর্বক্ষণ এগিয়ে চলেছে, যেখানে কালজয়ী সত্যগুলো নতুন নতুন পরিবেশকে গ্রহণ ও পরিব্যাপ্ত করছে...।" "সময়ের অতিক্রান্ততা এবং সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে এর সার্বক্ষণিক নবায়ন... নতুন নতুন যুগলক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য" ( ৮৫-৮৬, ৯)।

পোপ দ্বিতীয় জন পল অনুসারে, মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য অবশ্যই এর অত্যাবশ্যকীয় দিকগুলোর মধ্যে ওকউ এর প্রচারকার্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। "খ্রীষ্টীয় বার্তার একটি অপরিহার্য দিক হল, খ্রীষ্টমণ্ডলীর মঙ্গলবাণী ঘোষণা প্রেরণদায়িত্বের অন্তর্গত তার সামাজিক শিক্ষা শিক্ষাদান ও প্রচার করা, কেননা এই শিক্ষা খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহনের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে সেই বার্তার প্রত্যক্ষ

ফলগুলো নির্দেশ করে, প্রাত্যহিক কাজ নির্ধারণ করে দেয় এবং ন্যায্যতার জন্য সংগ্রাম করে" (পোপ দ্বিতীয় জন পলের পত্র 'শতবর্ষ')। তাঁর এই কথাকে উদ্ধৃত ক'রে STC এর সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে : এটা কোন সামান্য বিষয় বা কাজ নয়... এর অবস্থান খ্রীষ্টমণ্ডলীর সেবাকাজের সেবাদায়িত্বের একেবারে কেন্দ্রে" ( ৬৭, দ্র: ৭)। "সকল স্তরে ও সকল খাতে সামাজিক বিবেক গঠনে অবশ্যই বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।" এক সৃজনশীল উপায়ে, STC হচ্ছে "গঠনদান ও কর্মতৎপরতার জন্য একটি মূল্যবান উপকরণ"।

STC -কে পরিচিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেক আগেই ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতীয় বিশপ সম্মিলনী ভারতীয় লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট STC-কে পরিচিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ সম্মিলনীতে আরও বলা হয় যে, ভক্তসাধারণের আধ্যাত্মিক ও ধর্মতাত্ত্বিক গঠনকে অবশ্যই STC এর উপর জোর দিতে হবে। এ সম্মিলনীতে সর্বোপরি দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার উদ্বোধনী ভাষণে প্রদত্ত পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের এ কথাগুলো উদ্ধৃত করা হয় : খ্রীষ্টমণ্ডলীর অবশ্য কর্তব্য হল, সামাজিক ও সমাজগত বার্তার পরিব্যাপ্তিতে অবদান রাখা। মাত্র এভাবেই খ্রীষ্টমণ্ডলী (হয়ে উঠতে এবং) নিজেকে সকল মানুষের জন্য মণ্ডলী হিসেবে এবং সর্বোপরি দরিদ্রদের মণ্ডলী হিসেবে তুলে ধরতে পারে।"

১৯৭১ খ্রী: পোপ ষষ্ঠ পল সর্বোপরি ঘোষণা করেছিলেন যে, এ ধরনের ব্যাপকবিস্তৃত তারতম্যময় পরিস্থিতির মুখে একটি সমন্বয়ধর্মী বার্তা ঘোষণা করা এবং বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা মেলে এরূপ একটি সমাধানের প্রস্তাব করা আমাদের পক্ষে কঠিন । এ ধরনের আমাদের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই বা এটা আমাদের লক্ষ্যও নয়। আন্তরিকতার সাথে তাদের নিজ নিজ দেশের সঙ্গে মানানসই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা ও এ পরিস্থিতির উপর মঙ্গলসমাচারের অপরিবর্তনীয় বাণীর আলো প্রক্ষেপণ করা এবং STC থেকে অনুচিন্তনের জন্য নীতিমালা, বিচারের জন্য নিয়মাবলী এবং কাজের জন্য নির্দেশাবলী গ্রহণ করা, এ সবই নির্ভর করছে খ্রীষ্টীয় সমাজগুলোর উপর... খ্রীষ্টীয় সমাজগুলোর উপর আরও নির্ভর করছে, দায়িত্বশীল বিশপগণের সঙ্গে মিলন-বন্ধনে থেকে এবং অন্যান্য খ্রীষ্টীয় ভাইবোন ও সকল সুধীমহলের সঙ্গে সংলাপে রত থেকে, অগ্রাধিকার ও অঙ্গীকারসমূহ নির্ণয় করা, যেগুলো বিভিন্ন ঘটনায় আশু প্রয়োজন বলে দেখা হয় এরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে দাবি করা হয় (OA, 4)।

এই উপায়ে, পোপ ষষ্ঠ পল যে সকল সমাধানের পোপগণ প্রস্তাব করতে পারেন তার থেকেও অনেক বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে বের করার জন্য স্থানীয় বিশপগণকে এবং সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আমাদের আরও আহ্বান জানিয়েছেন আমরা যেন এ কাজটি সকল সুধীমহলের সঙ্গে একসাথে করি। এইভাবে, STC এর এবং একটি প্রাসঙ্গিক সামাজিক নীতিজ্ঞানের বিকাশ বা উন্নয়নে পালনের জন্য সকল মানুষেরই রয়েছে একটি ভূমিকা। তবে, বাস্তবমুখী পরিস্থিতিতে, একজনকে অবশ্যই নানাবিধ যুক্তিসঙ্গত সম্ভাব্য পছন্দসমূহকে স্বীকার করে নিতে হবে। একই বিশ্বাস বা মূল্যবোধ বিভিন্ন অঙ্গীকারের দিকে চালিত করতে পারে। তথাপি খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের (এবং অন্যদেরও) অবশ্যই 'কাঠামোগুলিকে বিকশিত করে তোলার' আর 'সমাজের একটি ন্যায় এবং ... আবশ্যিক রূপান্তর' ঘটানোর কাজে সহযোগিতা করা শিখতে হবে। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লাতিন আমেরিকার বিশপগণ যেমনটি উল্লেখ করেছেন, তাদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন ঐতিহাসিক কর্মপরিকল্পনা, যেগুলো একটি উল্লিখিত সময়ের এবং একটি উল্লিখিত সংস্কৃতির চাহিদাসমূহ পূরণ করে, সেগুলোর সঙ্গে সহযোগিতায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে আর ভ্রাতৃত্ব, ন্যায্যতা ও শান্তির বাস্তবসম্মত বিকাশে সাহায্য করতে হবে।

সুতরাং, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ পল জানিয়েছেন কাজ করার প্রতি একটি নতুন ও সনির্বন্ধ আহ্বান। তাঁর ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে করা আবেদনের কথা খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে *(দ্র: পরবর্তী পৃষ্ঠার বক্স)* তিনি তাদের এ বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন : এ পর্যন্ত সে কি করেছে, আর এখন তার কি করা কর্তব্য, তা প্রত্যেকেই নিজেকে পরীক্ষা করে দেখুক। এক্ষেত্রে নীতিমালাগুলোর স্মরণ,

উদ্দেশ্য তুলে ধরা, নিদারুণ অবিচারগুলো নির্দেশ করা এবং প্রাবক্তিক প্রত্যাখান উচ্চারণ করা যথেষ্ট নয়; এগুলোর প্রকৃত ওজন হারাবে যদি না এগুলোর সঙ্গে জড়িত থাকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্বের প্রাণবন্ত সচেতনতা এবং কার্যকর পদক্ষেপ। প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যায্যতার সহভাগি আর তাই প্রত্যেকেরই মনপরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই STC অবশ্যই সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসী ও সুধীমহলকে ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মকাণ্ডের দিকে চালিত করবে।

## ৩। ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর চেতনা বা ভাবধারা বুঝতে হলে, আমাদের প্রয়োজন এর বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশক কিছু অনুপ্রেরণামূলক বাণীর উপর আলোকপাত করা। ভারতীয় মণ্ডলীর উদ্দেশে বিশপগণের ১৯৭০ খ্রী: বাণীতে বলা হয় : আমরা এমন এক সময় মিলিত হয়েছি, যখন বিরাট বিরাট সমস্যা বিশ্ব সমাজকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, আর আমাদের দেশও এ দিক থেকে পিছিয়ে নেই। আমাদের সকল পরামর্শে আমরা গভীরভাবে অবগত ছিলাম সর্বত্র সকল সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের এ যুগের অন্যায় ও বৈষম্য প্রতিকারের গভীর বাসনার ব্যাপারে, অবগত ছিলাম বলিষ্ঠ শক্তিগুলোর ব্যাপারে যেগুলো আজকে একটি ন্যায় সামাজিক ব্যবস্থা ও শান্তির জন্য জগতে সক্রিয় রয়েছে... আমরা ঈশ্বরের সামনে মণ্ডলী ও আমাদের দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে পূর্বের থেকে অনেক বেশী সচেতন।

এই একই মনোভাব বিশপগণের শ্রম বিষয়ক কমিশন প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল : আমরা গঠন করেছি একটি কমিশন যার একমাত্র কাজ হবে শ্রমের বিষয়টি দেখা। আমরা দুর্দশার ব্যাপারে সচেতন যার জন্য কৃষি ও শিল্পে জড়িত শ্রমিক শ্রেণীর অদৃষ্ট এবং তাদের জীবনবস্থার মানবিকীকরণের ও তাদের অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমরা ভূমি সংস্কার, বেকারত্ব ও অস্থায়ী নিয়োগের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাজে এগুলোর ফলাফলের ব্যাপারে অবগত আছি। 'On the Development of Peoples' নামক পত্রে প্রদত্ত পোপ পলের প্রস্তাবগুলোর অনুসরণে আমরা সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে প্রার্থনা করছি এবং আমাদের সাধ্যমত সবকিছুই করার সঙ্কল্প করছি। মণ্ডলীকে অবশ্যই তার সামাজিক শিক্ষাকে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট পরিচিত করে তুলতে এবং সুষ্ঠু সামাজিক ব্যবস্থা আনয়নে তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হবে। শ্রম কমিশনের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে এই প্রৈরিতিক কাজে আমাদের অসংখ্য ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও ভক্তসাধারণকে নিয়োজিত করার আশা আমরা রাখি।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মে দিবসে, ভারতীয় বিশপ সম্মিলনী দরিদ্র ও উন্নয়ন বিষয়ক একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। এখানে বিশপগণ ঘোষণা করেন : আমাদের মণ্ডলী... আমাদের নিজেদের দেশে দরিদ্রতা ও বেকারত্বের গভীরে স্থিত কারণগুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। যেহেতু আমরা 'প্রতিটি মানুষ আমার ভাই' এ মৌলিক খ্রীষ্টীয় সত্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাই আমরা এ-ও আশা করি, আমরা সে সকল সুযোগ যেগুলো নিজেদেরকে শোষণধর্মী সমাজ, যা এর সামাজিক কাঠামোগুলোর মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের দাসত্বকে স্থায়ী রূপ দান করে,

> **খ্রীষ্টভক্তরাই উদ্যোগ নিক**
>
> *"তাদের নিজস্ব দায়িত্ব হিসেবে খ্রীষ্টভক্তদের জাগতিক ব্যবস্থার নবায়নকে কাঁধে তুলে নিতে হবে। এক্ষেত্রে যদি যাজকশ্রেণীর কাজ হয় অনুসরণীয় নৈতিকতার নিয়মাবলী নির্ভুলভাবে শিক্ষা দেওয়া ও ব্যাখ্যা করা, তাহলে খ্রীষ্টভক্তদের কাজ হবে, আদেশ-নির্দেশের জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষায় না থেকে, স্বাধীনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং খ্রীষ্টীয় মনোভাবকে যে সমাজের মধ্যে তার বসবাস তার ভাবধারা, রীতিনীতি, আইন ও কাঠামোসমূহের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো। পরিবর্তন অপরিহার্য, মৌলিক সংস্কার অত্যাবশ্যক : খ্রীষ্টভক্তদের উচিত মঙ্গলসমাচারের মনোভাব নিয়ে এগুলো পরিব্যাপ্ত করার লক্ষ্যে দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করা" (পোপ ষষ্ঠ পল, OA, 48)।*

তার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি ও ন্যায্যতার জন্য আর্তনাদ করে, সেগুলোর প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম হব। দারিদ্রের প্রধান প্রধান কারণকে ঘিরে এর ভাবনা প্রকাশ এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এ সকল কারণকে দূরীভূত করার লক্ষ্যে এদেশের প্রচলিত আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের মণ্ডলী একাত্মতা প্রকাশ করে।

বিশপগণ আরও বলেন : মানুষ হচ্ছে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রিয় দিক, উৎস, লক্ষ্য ও অর্থ... যীশুর নিজের প্রেরণদায়িত্ব মানুষের অভাব নিরসনের সঙ্গে অনেক বেশী সম্পৃক্ত ছিল। তিনি ক্ষুধার্তদের জন্য রুটি ও মাছের, প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন নতুন অঙ্গের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং অসুস্থদের দান করেছিলেন সুস্থতা। মণ্ডলীকে অবশ্যই তাঁর প্রেরণদায়িত্বকে এগিয়ে নিতে হবে আর আজকে তিনি খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাজের জন্য, সংক্ষেপে বলতে, মানব মর্যাদা ও ন্যায্যতার জন্য আমাদের সহ-ভাইদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। মানব ইতিহাসের সমগ্র প্রবাহ একটি বিশাল ঐক্যধর্মী আন্দোলন দ্বারা পরিচালিত বলে মনে হয়, আর মনে হয় যেন মানুষ... ন্যায্যতায় সুস্থিত এবং শান্তির মুকুটে শোভিত একটি জগত প্রতিষ্ঠায় সামনের দিকে অগ্রসরমান।

## ৪। ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর চূড়ান্ত বিবৃতি

আমাদের এ আলোচনায় ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর সবগুলো দলিল নিয়ে নয়, কিন্তু এখানে শুধুমাত্র এর বিভিন্ন সাধারণ পরিষদের মিটিং-এর চূড়ান্ত বিবৃতিগুলো নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। তবে, এ আলোচনায় ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর বিবৃতিগুলো থেকে কিছু সম্পূরক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পোপ ষষ্ঠ পল যেমনটি গুরুত্বারোপ করেছেন, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের মণ্ডলীগুলো বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষাকে পূর্ণতা ও বাস্তবরূপ দান করবে। এই কারণে এগুলোর আলোকপাতগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি অপরিহার্যও।

ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক শিক্ষা দেশের বিশেষ বিশেষ নৈতিক চেতনা ও সমস্যার, এবং আমাদের দেশে ও মণ্ডলীতে সক্রিয় চিন্তার ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ প্রবণতার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল। সামাজিক শিক্ষা প্রণয়ন বা গঠনে জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজনের তুলনায় এখনো অনেক কম হলেও, সচরাচর যেমনটি ভাবা হয় তার থেকে অনেক বেশী অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি তৃণমূল পর্যায়ে অসন্তুষ্টি ও বিরোধিতায় এগুলোর অন্তত:পক্ষে পরোক্ষভাবে প্রভাব রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, অনেক খ্রীষ্টবিশ্বাসী ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাদের মধ্যে কারো কারো আবার তাদের বিভিন্ন সম্মেলনে ও কমর্শালায় অংশগ্রহণ ঘটছে।

সর্বোপরি কিছু বুদ্ধিজীবি নেপথ্য কাগজ-পত্র প্রস্তুত করেছেন অথবা ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর খসড়া কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'দেশের আশু চাহিদাগুলোর প্রতি মণ্ডলীর সাড়াদান' শীর্ষক ১৯৭৮ খ্রী: ম্যাঙ্গালোর সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতিতে, বিশপগণ ফা: জে. ডুপুইজ ও টি.এ. মাথিয়াসের ধারণাপত্র, সিবিসিআই কমিশনগুলো ও জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিলের প্রতিবেদন, 'মানব-উন্নয়ন' ও 'খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচার' শীর্ষক পোপগণের সার্বজনীন পত্র, সর্বভারতীয় সেমিনার ও অন্যান্য সম্মেলন থেকে কিছু অংশবিশেষ, কিছু অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ, এবং কর্মশালার রূপরেখার সাহায্য নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ছিল দু'টি প্রারম্ভিক ভাষণ।

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে, যেখানে 'সমসাময়িক সমাজের চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি মণ্ডলীর সাড়াদান' ছিল সম্মেলনের মূলসুর, ফা: আলফ্রেড ডি'সুজা প্রস্তুত করেছিলেন ধারণাপত্র এবং ফা: জে. ডুপুইজ প্রস্তুত করেছিলেন সাড়াদান। তারা উভয়ই ছিলেন খসড়া কমিটির সদস্য। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, তাদের সঙ্গে ব্যাপক পরামর্শে বিশপগণ লক্ষ্য করেছিলেন জনগণের আগ্রহ।

বিভিন্ন ভারতীয় বিশপ সম্মিলনীর সভার মূলভাবের পছন্দকে প্রভাবিত করেছিল তিনটি প্রধান বিষয় :

(১) বিশ্বজনীন মণ্ডলীর জীবন, বিশেষ করে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, পোপীয় দলিলসমূহ, রোমে বিশপগণের সিনড, ২০০০ খ্রীষ্টজয়ন্তী;

(২) দেশীয় মণ্ডলীর চলমান অবস্থা, উদাহরণস্বরূপ, তার নিজের সাধারণ দিকনির্দেশনা ও সংগঠনের জন্য আবশ্যিক নীতিমালা, তার কিছু প্রতিষ্ঠান

ও ধর্মপল্লীর নবায়ন, এবং ১৯৬৯ খ্রী: সর্বভারতীয় সেমিনার ও CBCI-র সুবর্ণ জয়ন্তীর (১৯৪৪-১৯৯৪) ন্যায় কিছু ঘটনাবলী;

(৩) দেশের চলমান অবস্থা ও মূল্যায়ন (যেমন দরিদ্রতা ও উন্নয়ন, বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা, জাতীয় সংহতি, বিশ্বায়ন, ইত্যাদি বিষয়ক সাধারণ সমস্যাবলী, ধারাসমূহ ও নীতিমালা, এবং কিছু বিশেষ ঘটনাবলী, যেমন অযোধ্যা ও গুজরাট হত্যাকাণ্ড ও দেশের স্বাধীতার সুবর্ণ জয়ন্তী)।

## ৫। আমাদের অধ্যয়নের প্রক্রিয়া, পরিধি ও রূপরেখা

আমাদের অধ্যয়নের প্রক্রিয়া, পরিধি ও রূপরেখাকে পরিষ্কার করে তোলার জন্য কিছু ব্যাখ্যা সহায়ক হতে পারে।

প্রথমত, এখানে সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে বিশপগণের শিক্ষা উপস্থাপনে যতটা সম্ভব বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল হওয়ার। এই কারণে খুব বেশী পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলার লক্ষ্যে, অনেক সময় তাদের শিক্ষার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন উন্মুক্ত মনোভাবের অধিকারী হওয়া এবং বিশপগণের সঙ্গে অন্বেষণ করা। কেননা তাঁরা মূলত যা করেছেন তা হচ্ছে, প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিকে বারংবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করা। বিশপগণের অনুচিন্তনগুলির উপর নির্ভর ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে চলার লক্ষ্যে, এখানে লেখকের ব্যক্তিগত মতামতও খোলাখুলি প্রকাশ করা হয়েছে (বিশেষ করে, কোন একটি অংশের বা অধ্যায়ের শেষের দিকে)। পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ সেই একই সৃজনশীল ও গঠনমূলক কার্যক্রম বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য ! বিশপগণ নিজেরাই যেমনটি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের সংলাপই আজকের জগতের চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি সাড়াদানে আমাদের সাহায্য করবে।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে যে, এই অধ্যয়নের প্রধান ভাবনা ও আলোকপাত হচ্ছে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা। সুতরাং এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষার একটি সার্বিক উপস্থাপনা তুলে ধরা এবং এ মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক প্রেরণদায়িত্ব ও ঈশ্বরের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা। তেমনি উদ্দেশ্য নয়, ঐশতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা, যেমন খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা, খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রকৃতি, অন্তিমকালীন পরিত্রাণ বা 'মোক্ষ', 'প্রত্যক্ষ' মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য, ধর্মগুলোর ঐশতত্ত্ব, ইত্যাদি। এ ধরনের বিষয়গুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এগুলো অপর একটি প্রেক্ষাপটে আলোচনা হওয়া উচিত। এ আলোচনায় এগুলোর কথা কখনো কখনো উল্লেখ ঘটলেও, তা হয়েছে বিশপগণের সার্বিক ভাবনার ও সামাজিক বিষয়সমূহ তাঁদের তুলে ধরার ধরনের কারণে, কিন্তু সেগুলো আমাদের আলোকপাতের বিষয় নয়।

তৃতীয়ত, আমাদের অধ্যয়নের রূপরেখা নিম্নরূপ। এই ভূমিকা উপস্থাপনের (অর্থাৎ অধ্যায় ২) পর, আলোচনার জন্য পরবর্তীয় ৪টি অধ্যায়ের বিষয়গুলোর মূলসুর হচ্ছে : ভারতীয় পরিস্থিতি (৩), খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক মঙ্গলসমাচার ও প্রেরণদায়িত্ব (৪), জগতের সঙ্গে সংলাপ ও সংহতি প্রকাশ (৫), প্রধান প্রধান ভাবনা ও মধ্যস্থতাসমূহ (৬)। পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হবে অনেকবেশী আভ্যন্তরীণ বিষয়, তবে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক সম্পৃক্ততার আলোকে : খ্রীষ্টমণ্ডলীর নবায়ন (৭) এবং মণ্ডলীতে ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ (৮)। শেষের পাঁচটি অধ্যায়ে সন্ধান করার চেষ্টা করা হবে কিভাবে খ্রীষ্টমণ্ডলী সামাজিক পরিবর্তনের একটি কার্যকর কর্মী হয়ে উঠতে পারে : খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সমাজ সেবাকর্মীগণ (৯), দিকনির্দেশাবলী, কার্যক্রমসমূহ এবং বাস্তবায়ন (১০), প্রাসঙ্গিক কাঠামোসমূহের নির্মাণ (১১), ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে (১২), এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রৈরিতিক অগ্রাধিকারসমূহ (১৩)। সবশেষে উপসংহার : সত্য আবিষ্কার ও সত্যে বসবাস (১৪)।

চতুর্থত, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এর অগ্রগতিশীল প্রকৃতি এবং এর সকল ইতিবাচক দিক সত্ত্বেও, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আরও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। একে খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষা বলা হলেও, বলতে গেলে এর প্রায় সকল সদস্যের অংশগ্রহণ (তার শ্রেণী ও সারি) এর প্রণয়নে খুবই লোক-দেখানো পর্যায়ে রয়ে যায়। খ্রীষ্টমণ্ডলী কে ? দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় বিশপগণের

বিশেষ ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তবে পাশাপাশি খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণকার্যে সকলের দায়িত্ব ও অংশগ্রহণেরও উপর আলোকপাত করা হয়েছে। খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা রচনায় খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের কি পরামর্শ চাওয়া হয়েছে ও তাদের সম্পৃক্ততা ঘটেছে ? এই শিক্ষায় কি তৃণমূল পর্যায়ের লোকদের অবদান সত্যিকার অর্থে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত, বিশেষ করে যারা দরিদ্র ও অশিক্ষিত, নারী ও যুব, দলিত ও আদিবাসী ? খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা কি সত্যি সত্যিই তাদের অভাব-অনটন, দুর্ভাবনা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর এমনকি তাদের মঙ্গলসমাচারকে ঘিরে তাদের ধ্যানজ্ঞান প্রকাশ করে ? খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা কি তাদের কণ্ঠস্বর ? সেই সাথে এটা কি অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, যাকে পোপ ষষ্ঠ পল স্বাগত জানিয়েছিলেন, তার কণ্ঠস্বর ?

তৃণমূল পর্যায়ের লোকদের আন্তরিক অংশগ্রহণ খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটাবে। ফলে এ শিক্ষা লাভ করবে গভীর নিবিড়তা ও অত্যাবশ্যকীয়তা আর হয়ে উঠবে অনেক বেশী বাস্তব এবং আবেগপ্রবণ। পাল্টে যাবে এর ভাবনা, আলোকপাত ও শব্দাবলী। মণ্ডলী সমাজে তার ভূমিকা, তার অবস্থান, সেবাকাজ ও নিয়োজন, দরিদ্রদের পক্ষাবলম্বনে তার গড়িমসি, অন্যায্যতা অস্বীকারের অনেক বেশী সমালোচনামূলক হয়ে উঠবে আর হয়ে উঠবে প্রাবক্তিক, তার বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক বিবৃতি এবং বাস্তবতা ও বাস্তবায়ন ইত্যাদির মধ্যে অতীব ফারাক। তৃণমূল পর্যায় থেকে সত্যিকার অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ কোন সহজ আদর্শ নয়, তবে এ অংশগ্রহণ খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা ও এর বাস্তবায়নে প্রভূত উন্নতি ঘটাবে। আমরা কি কল্পনা করতে পারি খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা কি হয়ে উঠবে যখন পুরোহিত, ধর্মব্রতী ও সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তসীমার মানুষজন, বিশপগণ তাদের প্রত্যেককে যে যে ভূমিকা বণ্টন করে দিয়েছেন তা পালন বা সম্পন্ন করবেন ?!

## ৬। ফলপ্রসূ পাঠ ও প্রাসঙ্গিক কাজের নানা পরামর্শ

সুপ্রিয় পাঠক, এই বইটি সকলের নিকট আবেদন, একটি চ্যালেঞ্জ। প্রত্যেকেই পারি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় অবদান রাখতে – এমনই এক অবদান, যা আমাদের প্রত্যেকের অনেক সামর্থ্যের মধ্যেই এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণও। সুতরাং, এই বইটিকে আত্মস্থকরণ, সম্পূর্ণতাদান এবং বাস্তবরূপদানের লক্ষ্যে, এর যথোপযুক্ত ব্যবহার ঘটাতে হবে। অন্য কথায়, 'নিষ্ক্রিয়' পাঠক হয়ে থাকব না। আমরা ভাবব, সমালোচনামূলক ও সৃজনশীল হব, ভাল ভাল ধারণা ও প্রস্তাবনার কথা চিন্তা করব এবং এগুলিকে আমাদের জীবন ও পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। আমাদের পরিবার, পাড়া-পড়শী ও বন্ধুদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করব এবং সম্ভব হলে একটি কার্যকরী দল গঠন করব। সংক্ষেপে বলতে, এই বইটিকে আমরা করে তুলব সহভাগিতা ও কাজের একটি হাতিয়ার। আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব উপায়ে এ কাজটি করতে পারি।

সুপ্রিয় পাঠক, আপনি যদি খ্রীষ্টান না হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী হন, তবে এ অধ্যয়নকর্ম আপনার জন্য হবে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ। CBCI-র অধিকাংশ বিবৃতি খ্রীষ্টানদের জন্য লিখিত। অর্থাৎ, প্রায় সকল খ্রীষ্টানদের জন্য এটা বিধিসঙ্গত, এবং সম্ভবত অনেক আবেদনধর্মী। তারপরও, এটা কিন্তু উপস্থাপন করে বিশেষ বিশেষ অসুবিধা। বিশপগণ অনেক সময় আপনার উদ্দেশে সরাসরি কথা বলবেন এবং আপনার ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষায়, অথবা মানবীয় নীতিমালা ও মূল্যবোধের সার্বজনীন ভাষায় কথা বলবেন। আপাতত:, CBCI-র বিবৃতিগুলো পাঠ করে, আপনি প্রবেশ করবেন অন্য সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে সংস্পর্শে ও সংলাপে। এমনকি খ্রীষ্ট ও তাঁর বাণী আপনাকে অনুপ্রাণিত করলেও, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল মহাত্মা গান্ধী ও আরো অনেকের ক্ষেত্রে, আপনি হয়ত মুখোমুখি হবেন এমন কিছু শব্দ বা প্রকাশভঙ্গির যেগুলো আপনার নিকট অর্থহীন বা অদ্ভুত, এমনকি কিছু আপনার নিকট 'পীড়াদায়ক'ও শুনাতে পারে। সংলাপ সহজ কিছু নয়। (আর খ্রীষ্টানদেরও উচিত আপনার পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য পাঠ করার। আপনার

কাছ থেকেও আমাদের অনেক কিছুই শিখার আছে)।

আপনি যদি এ ধরনের কোন সমস্যার মুখোমুখি হন, তাহলে আমাদের খ্রীষ্টানদের ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। তবে এতে হতাশ হবেন না; এগুলো এড়িয়ে চলার মাধ্যমে যা গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি মনোযোগ দেবেন। প্রয়োজনে, এই বইয়ের কিছু অনুচ্ছেদ বা অংশ বাদ দিয়ে পড়তে পারেন। কিছু ‘পাসওয়ার্ড’ অথবা ‘আংশিক-প্রতিশব্দ’ আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সুসমাচার বা মঙ্গলসমাচারকে অর্থপ্রদ ও প্রাসঙ্গিক কিছু হিসেবে, আর ঐশরাজ্যকে একটি নতুন/উত্তম সমাজ বা ঈশ্বরের পরিকল্পনামত জগত হিসেবে বুঝার চেষ্টা করবেন। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে, খ্রীষ্টানদের ভূমিকাকে নির্দেশ ক’রে (উদাহরণস্বরূপ, ‘জগতের আলো’ ও ‘পৃথিবীর লবণ’), বিশপগণ মূলত: অনেক সময় সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা ও মূল্যবোধসমূহকেই বুঝিয়েছেন বা এগুলো সম্বন্ধে বলেছেন। মনে রাখতে হবে যে, মণ্ডলী ও তার প্রেরণকার্য এর উল্লেখ ক’রে (যেমন, উন্নয়ন, ন্যায্যতা ও স্বাধীনতাকে ঘিরে), বিশপগণ অনেক সময় সেই কাজের কথাই বলেছেন যা প্রতিটি দল ও সমাজকেও সম্পৃক্ত করে।

যাহোক, অন্য ধর্মবিশ্বাসী প্রিয় পাঠক, ২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করুন। পরে, আপনার ভাবনাগুলো খ্রীষ্টীয় ব্যক্তিবর্গ বা দলের সঙ্গে সহভাগিতা করুন, এক্ষেত্রে বন্ধুদের দিয়ে শুরু করলে ভাল হয়। তুলনা থেকে, আপনি খুব সম্ভবত লাভ করবেন অনেক শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা। এই প্রক্রিয়ায়, আপনি আপনার নিজস্ব বিশ্বাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন, আপনার খ্রীষ্টান বন্ধুদের আরও ভালমত বুঝতে পারবেন এবং তাদের উদাত্ত আহ্বান জানাতে পারবেন তাদের সামাজিক অঙ্গীকারে আরও নিষ্ঠার সাথে বসবাস করার জন্য। এইভাবে আপনি সক্ষম হবেন ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ সংলাপকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে। আপনি আরও পারবেন একটি প্রাসঙ্গিক সামাজিক শিক্ষা বা নীতিশাস্ত্র প্রণয়নে এবং বিশেষ করে আপনার পারিপার্শ্বিকতায় একটি নতুন সমাজ গঠনে অবদান রাখতে।

### আমূল উন্মুক্ততা এবং বিনম্র সংলাপ

*A. Mariaselvam দেখিয়েছেন যে, ‘খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রধানত প্রবক্তাগণের একটি সমাজ।’ আমাদের মণ্ডলী অনেক সময় এ কথা ঘোষণা করে যে, অ-খ্রীষ্টানদের উদ্দেশে তার প্রাবক্তিক ভূমিকার কোন সীমারেখা নেই। তথাপি তাদের নিকট উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীকে অবশ্যই ঐশবাণীর সাহায্যে একটি আনুপুঙ্খিক সমালোচনায় নিজেকে ন্যস্ত করতে হবে। আজকের বাস্তবমুখী পরিস্থিতিতে, তাকে সর্বোপরি প্রস্তুত থাকতে হবে অ-খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের প্রাবক্তিক মধ্যস্থতায় নিজেকে বিনম্রতায় সঁপে দেওয়ার জন্য... সার্বজনীন হিসেবে খ্রীষ্টমণ্ডলী একমাত্র তখন প্রাবক্তিক হয়, যখন সে তার গণ্ডীর বাইরে প্রাবক্তিক বাণীর সার্বজনীনতা (বিশ্বজনীনতা) স্বীকার করে নেয়। কাজেই, মণ্ডলীকে অবশ্যই অত্যন্ত সযত্নে “বহিস্থ প্রাবক্তিক বাণী” (তুল্যমূল্য জ্ঞান এবং) শ্রবণ করতে হবে।*

*প্রাবক্তিক এবং প্রাবক্তিকবাদের প্রতি আমূল উন্মুক্ততা দু-ই হওয়ার বিশ্বজনীন দায়িত্বসমূহের উপর এ ধরনের আলোকপাত সকল ধর্মের মানুষকে নিজেদের শ্রেষ্ঠম্মন্যতা বিসর্জন দিয়ে সত্যের জন্য অভিন্ন সন্ধান ও সংলাপে বিনম্র সহযোগী হয়ে ওঠার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানায়।*

তথাপি যে সকল পাঠকগণের রয়েছে, বিশেষ করে সামাজিক ক্ষেত্রে, নেতৃত্বদানের নানা দায়িত্ব বা গুণাবলী – উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান, কার্যদল, গণ প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের প্রশিক্ষক, সংগঠক ও উদ্দীপনাদানকারীগণ – তাদের জন্য আছে আরও বড় একটি চ্যালেঞ্জ। আমার সেই বন্ধুদের কথা কি মনে আছে যারা আমাকে এই বইটিকে, বিশেষ করে সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও যুবদের জন্য– কাজের একটি হাতিয়ার, ক্ষমতায়নের একটি উপকরণে রূপান্তরিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, এটা করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে আমার লেখার মধ্য দিয়ে এবং আরও পাঠের জন্য প্রশ্নমালা, বিভিন্ন প্রস্তাবনা এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আবেদন পেশ

করার মধ্য দিয়ে।

তবে আমি এর বেশী করতে পারি না। উদারণস্বরূপ, আমাদের দেশের বিচিত্র পরিস্থিতির জন্য আমি বাস্তবমুখী নির্দেশাবলীর প্রস্তাব করতে পারি না। কাজেই, আমাকে নির্ভর করতে হয় তাদের উপর যাদের রয়েছে নেতৃত্বদানের গুণাবলী – বাস্তবিকপক্ষে, আপনারা সবাই ! এই বইয়ের বিষয়বস্তু ও উপকরণগুলোর সঠিকভাবে ব্যবহার করুন। আরও অনেক পাঠককে খুঁজে বের করুন ! বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিবৃতি দিন, আয়োজন করুন কর্মশালা ও সেমিনারের, গঠন করুন সহভাগী বা কার্য দল, এই অধ্যয়নকে সহজসাধ্য করে তুলুন, বিভিন্ন পরিস্থিতি ও শ্রোতার জন্য একে মানানসই করে তুলুন, ছোট ছোট নিবন্ধ লিখুন, স্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন অনুচ্ছেদ অনুবাদ করুন, সামাজিক দিক থেকে আরও বেশী সচেতন ও নিবেদিত হওয়ার জন্য লোকদের সাহায্য করুন, বিভিন্ন কার্যক্রম ও সংগ্রামে তাদের সম্পৃক্ত করুন, যারা নেতৃত্ব দান করবেন তাদের গঠন করুন, ইত্যাদি। সংক্ষেপে, এই বইটিকে যতটা সম্ভব লোকের জন্য একটি ক্ষমতায়নের উপকরণ, অনুপ্রেরণা ও প্রাসঙ্গিক কাজের উৎস করে তুলুন !

*তাঁর ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের সফরের স্মরণে
হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল চার্চ চত্বরে স্থাপিত
পোপ দ্বিতীয় জন পলের আবক্ষ মূর্তি।*